IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব

Psychological effect on North Indian classical music

ড. ছায়া রানী মন্ডল

শাস্ত্রীয় সংগীত বিভাগ, সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপঃ সঙ্গীত এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প। সংগীত শ্রবণে মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং সাক্ষাৎ আত্ম উপলব্ধির যে বিশেষ অনুভূতি অনুভব হয় তার রহস্য কোথায় তার মর্ম উদঘাটনের এক ছোট্ট প্রয়াস। সংগীতে মনের চর শিক্ষার মনোবিদ্যা সংগীত সাধনায় রহস্যময় অবচেতন মনের পরিচয় এবং প্রয়োজনীয়তা কোথায় তার এক সহজ চিত্র নিজস্ব ভাবনায় তুলে ধরার চেষ্টা মাত্র। প্রতিটি ভাব মনের ভাব অন্তর বিরোধ সৃষ্টি করে তীব্র আকুলতার পরিচয় দেয় যা অন্তর মুখী ভাবের অনুধাবন করে, শিল্পীর এই আত্ম্য অভিব্যক্তি সংগীত শিক্ষায় কতটা আবশ্যক তার এক সম্মুখ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

মুখ্য শব্দঃ শাস্ত্রীয় সংগীত, মনোবিজ্ঞান, রাগ, মনোবিদ্যা, অভিব্যক্তি, শিল্পী।

প্রবহমান জীবনের শুরুতে এক শক্তির ধারা বিরাজ করে। দর্শনের মাধ্যমে তাকে অনুভব করা হয় এবং তার সময়োচিত্ত পরিবেষণা করা হয়। এক কথায় বললে, যে সূক্ষরূপী চৈতন বা মন স্থূল বিকাশের সত্যতা বা সত্তাকে উন্মোচন করে। তাকে মন বলে। এই মন বা মনোবিজ্ঞান/মনোজ্ঞান ভাববাদী ক্রিয়ার এক স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া। সাধারণতঃ সৃষ্টির সকল জিনিসকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি বাহ্য ও অপরটি আন্তর (real and ideal) (Mental and material) উপনিষৎ বলে, জাগতিক সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি (Mental Concept) মনের গঠনমূলক চিন্তা থেকে। আমাদের বা মানুষের কল্পনা এবং চিন্তা মনের উপর নির্ভর করে। মন মানে চেতনা। প্রত্যেকটি চেতনার গতি প্রকৃতির অনুশীলন করাই মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। 'Psycho' মানে 'আত্মা' 'logic' অর্থ 'বিজ্ঞান'। এর বহুপূর্বে একে (Science of soul) নামেও বর্ণনা করা হয়েছিল। যাকে আত্মা সম্পর্কিত বিজ্ঞান বলা হয়। পরবর্তী সময়ে একে (science of mind) 'মানবমনের অনুশীলনকারী বিজ্ঞান' রূপে রূপান্তরিত করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবের "চেতনা অনুশীলনকারী বিজ্ঞান" (science of consciousness) বলা হতে থাকল। সর্বোপরি দেখা যায় মানুষের যে প্রতিনিয়ত ব্যবহার/গতিপ্রকৃতির ধারা, তাকে নিয়েই মনের স্থায়িত্ব তাতে দ্বিমত হবার নেই। মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু কি হবে তা এখনও সঠিক ঐক্যমত স্থাপিত হয়নি। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকার মনোবিদ্ (J. B. Watson) জে. বি. ওয়াটসন্ বললেন "মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হবে মানুষের আচরণ।"[১] কারণ বস্তুনিষ্ট বিজ্ঞান হিসাবে

মনোবিদ্যাকে যদি প্রতিষ্ঠিত করাতে হয় তবে তার অনুশীলনের বিষয়বস্তু এমন হওয়া দরকার যেটিকে নৈব্যক্তিক পদ্ধতিতে বিচার করা সম্ভব হবে। আর মানুষের আচরণকেই বাইরে থেকে বা নৈব্যক্তিক হিসাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। কাজেই ওয়াটসনের সময় থেকে আধুনিক সময়েও আচরণকেই মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যেকি মানুষের বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্রিয়া (mental process) কে নিয়ে চলে। বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত বেশীর ভাগ বিজ্ঞান, জড় পদার্থকে নিয়ে চলে। যেখানে জড়ের বিস্তৃতি আছে, অবস্থান আছে, কিন্তু মনের কোনো অবস্থিতি নেই। যার অবস্থান ঠিক করা হয়ে, সময়-স্থানের উপর নির্ভর করে। "যাকে বলা হয় (time-space dimension) এবং যেখানে মন একদম স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা উপরে নির্ভর করে তাকে (subjective dimension) বলা হয়ে থাকে। এই মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক আছে। যেমন

1. দেহতত্ত্বগত মনোবিদ্যা (Physiological Psychology)

2. সামাজিক মনোবিদ্যা (Social Psychology)

3. শিক্ষা মনোবিদ্যা (Educational Psychology)"[২]

শিক্ষা মনোবিদ্যা হল প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যা যার মধ্যে আমরা মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণকে অনুশীলন করে থাকি। যার মানে শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ। সাধারণ মনোবিদ্যায় ব্যক্তির আচরণ ও বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে, পরে তাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এবং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি প্রক্রিয়াকে সহজ ও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করা। প্রয়োগমূলক দিককে এখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে যেটা কি আমাদের সংগীতে একটি প্রধান অঙ্গ। সংগীত শিক্ষা সাধারণ ভাবে প্রয়োগমূলক হয়েও, তা চরম শীর্ষে পৌঁছাতে পারে না সবসময়। কারণ শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মননশীলতার প্রতিক্রিয়ার সঠিক (Aims of Educational Psychology) মূল্যায়ন করতে পারেনা। কাজেই শিক্ষা মনোবিদ্যার লক্ষ হচ্ছে মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণের গতি, প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নির্ণয় করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এবং অন্যান্য ব্যক্তিকেও আদর্শের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করা।

সংগীতিক মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু -

যে কোন বিদ্যাতে মননশীলতা অত্যাবশ্যক। সংগীতেও তার ব্যতিক্রম হয় না। উপরন্তু দেখা যায় সংগীত শিক্ষার মধ্যে সমস্ত বিদ্যার এক অটুট সমাহার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে ধর্ম থেকে সাহিত্য আবার ভূতত্ব থেকে ধ্বনিতত্ত্ব সব ক্ষেত্রেই সংগীতের অবস্থান লক্ষণীয়। কাজেই সাংগীতিক মনোবিদ্যার মূখ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে তার প্রাথমিক উপাদানগুলিকে অনুশীলন করা এবং তাকে সহজ ভাবে গ্রহণীয় করে তোলা। যে সমস্ত ক্রিয়া বা উপাদান গুলির মাধ্যমে সংগীত শিক্ষা এক সুষ্ঠু পরিবেশে অগ্রসর হতে পারবে সেগুলি হচ্ছে "বুদ্ধি (intelligence), চাহিদা (needs), তাৎক্ষণিক ক্রিয়া (reflex action), প্রক্ষোভ (emotion), প্রবৃত্তি (instinct), প্রবৃত্তিমূলক কর্ম (instinctive action)"[৩] এইগুলি সংগীত শিক্ষাকে গুরুত্বদান করার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। সাধারণভাবে একটি ধারণা আছে যে সংগীত মানুষের সহজাত ক্রিয়ার মধ্যে এক। কারণ প্রতিটি মানুষ এক ধারাবাহিকতার মধ্যে প্রবাহমান, তার এই গতির যে রীতি, ছন্দ এই গুলি সংগীতের মূল উপাদান। তবে এর মধ্যে ইচ্ছা, চাহিদা, প্রবৃত্তি, মনোযোগ এই সমস্ত না থাকলে সংগীত শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যাবে। বিশেষ করে শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষায় মনোবিদ্যার আলোচনা এক বিশেষ স্থানের দাবিদার। কাজেই এর একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে এখানে প্রয়াস মাত্র করা হয়েছে। সাধারণত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারা যায় যে পৃথিবীর কোনো বস্তুই চিরস্থায়ী নয়। প্রতিটি সৃষ্টির এক নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে আর তার মধ্যেই সে তার সমস্ত কল্পনাকে বাস্তবায়ীত করে থাকে। অর্থাৎ পার্থীব শরীরের মধ্যে এক আশ্চর্য ভাব বা মনের জগত থাকে, এই মন যা কল্পনা করে তাকে সে পরে রূপায়িত করে থাকে। কাজেই মন বা চিন্তাকে বাদ দিয়ে কোন

শিল্পই সৃষ্টি হতে পারে না। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, কাব্য সবই রূপায়িত হয় প্রথমে বুদ্ধিজীবী মানুষের মননে বা অর্ন্তলোকে, পরে বিকশিত হয় বাইরের জগতে। সংগীতে রাগ-রাগিনীর স্বভাব, তার রূপ কল্পনা ও এইভাবে প্রকাশ পায় অর্ন্তলোক থেকে বর্হিজগতে। গায়ক কেবল তার কল্পনাকে নিয়ে তৃপ্ত হতে পারে না, সে চায় তার মননধর্মী সুরসমষ্টি জানো নিজের সাথে সাথে অপরকেও সমপরিমাণে আনন্দনুভূতির স্পর্শ দেয়। মহর্ষি পতঞ্জলির 'যোগদর্শন' ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই 'যোগদর্শন' সর্ববৃত্তিযুক্ত মনকে সংযম ও স্থির থাকার কৌশল শিখিয়ে থাকে। এই মন হচ্ছে জীবশক্তির মূখ্যাংশ। সংগীতশাস্ত্রে যাকে শব্দ বা নাদ বলা হয়ে থাকে। যাকে 'শব্দব্রহ্ম' বলা হয়ে থাকে। সাংগীতিক শ্রুতি, স্বর, অলংকার, মূর্ছনা, তান, রাগ, তাল, ছন্দ এই সমস্ত কিছু শব্দব্রহ্মার বহিপ্রকাশ মাত্র। ধ্বনিই তার রূপ। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে বলা হয়েছে-

"ধ্বনিযোনি পরা জ্ঞেয়া ধ্বনিং সর্বস্য কারণম্ আক্রান্তং ধ্বনিনাং সবং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।"[৪]

সবকিছুর মধ্যে ধ্বনিই এক অদ্বিতীয় কারণ, স্থাবর-জঙ্গম্ সবার মধ্যে ধ্বনি বিরাজমান। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুই প্রকার ধ্বনির মধ্যে অব্যক্ত ধ্বনি শিল্পীর ইচ্ছার প্রেরণায় ব্যক্ত ধ্বনিতে পরিণত হয়ে স্বর ও সংগীতে প্রকাশ পায়। যে সংগীত মানুষের মনের গহনে সুসুপ্ত ভাবে থাকে। অবচেতন মনে যখন আকার নেয় তখন সে ব্যক্তিসত্তা (Personality) ও স্বরূপসত্তা (Individuality) র মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে বর্হিজগতে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। শার্সদেব প্রভৃতি সংগীতশাস্ত্রীরা এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, সার্থক শিল্পী তার ইচ্ছার প্রেরণায় প্রদীপ্ত হয়ে কারণীভূত শব্দ বা নাদের ক্রমবিকাশের পথে কাল্পনিক নাদ থেকে আকারে বিকাশ লাভ করে। কারণ সাংগীতক নাদ, শব্দ বা স্বরকে, রস, ভাব ও ধ্যানাত্মক বলে গ্রহণ করায় সংগীত যে শুধুই আঙ্গিক বা জ্যামিতিক বিশ্লেষণের জড় পরিণতি নয়, তারও উর্ধ্বে তার আসন; এই রহস্যই প্রাচীন ভারতের সূক্ষদর্শী শিল্পী ও সাহিত্যিকরা প্রমাণ করার চেষ্টায় আছেন। শার্সদেব আরও বলেছেন "নাদাত্মকং জগৎ।" "জগৎ নাদের আধারে সৃষ্ট।"[৫] সংগীতের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, শব্দ বা নাদ থেকে আদিকারণ রাগ জাতি, জাতি থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে ভাষা, এবং পরে অঙ্গরাগ। এইভাবে মনের বিস্তার হয়ে সম্পূর্ণ ভাবে সংগীতের রূপ নিয়ে থাকে। মন সম্পূর্ণ শরীরকে পরিচালনা করে থাকে। মনের কোনের ভাব যদি নাদ বা শব্দ সৃষ্টি করতে না চায়, বা শরীরি অন্য মাধ্যম দিয়ে প্রকাশ পেতে চায়, তবে সে সেই পথেই যাবে কারণ মন কারও অধীনে থাকতে পারে না। "কাজেই শব্দ 'কারণশব্দ' শরীরের বিভিন্ন স্থান বা মাধ্যম দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। যেমন, নখজ, বায়ুজ, চর্মজ, লৌহজ, শরীরজ, ইত্যাদি।"[৬] সংগীতে নখজ নাদ বলতে আঙ্গুলির সাহায্যে সৃষ্টি বীণার নাদ, বায়ুজ বলতে হাওয়ার সংঘাতে বাঁশী থেকে সৃষ্ট শব্দ বা নাদ, চর্মজ পাখত্বাজ, তবলার বাণী, লৌহজ শরীরজ। শরীরের যে কোন অংশের সংঘাতে সৃষ্ট শব্দ তথা নাদ সংগীত রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব সংগীতশাস্ত্রেরই কথা, যা কেবল মাত্র পুঁথিগত না হয়ে অনুভূতি অভিজ্ঞতা সংম্পূর্ণ স্বরজ্ঞানের পরিধি সৃষ্টি করে থাকে। কাজেই সংগীতের প্রকৃত মর্মকে অনুধাবন করতে হলে দার্শনিক মনোবিজ্ঞানের অনুধাবন একান্ত আবশ্যক বলে মনে হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীত সৃষ্টির মূলে যে মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের ভাবধারা দেখা যায় তা ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়ে থাকে। মানব মনের মানসিক ভাব উদ্বেলিত হওয়ার ফলে যে যে আবেগের সৃষ্টি হয় তার থেকেই বাণী বা ভাষার প্রকাশ হয়ে থাকে। সংগীতও তেমনি মানুষের ভাবাবেগের প্রকাশ মাত্র বলে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীকের মত। তাদের মতে মনের আবেগ, প্রবল হলে মানুষের মাথা, হাত ও পা বা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ চালনা হয়ে থাকে। কাজেই সংগীত মনের আবেগের প্রকাশ মাত্র, এর দ্বিমত নেই বলে পাশ্চাত্য দার্শনিকের ধারণা। কিন্তু ভারতের ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ঐকমত নয়, এখানে কেবল মাত্র আবেগ আসলেই শিল্প বা সংগীত সৃষ্টি হবে, তা সম্পূর্ণ যথাযথ নয় কারণ বিশুদ্ধ সংগীতের জন্য আবশ্যক স্বভাব সৌন্দর্যের সাথে সাথে আত্মসৌন্দর্যের অনুভূতি ও মর্যাদাবোধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন "ভারতীয় শিল্পী ও কবি প্রতিভা তাই স্বরের বর্ণ, কান্তি, গুণ ও চারিত্রিক বিশেষত্ব কল্পনা করে রাগের প্রকৃত ধ্যান মূর্তি রচনা করে থাকেন, এই সাতটি স্বর মানুষের মনে বিচিত্র রূপ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন

"ষড়জ বীর, রৌদ্র, অদ্‌ভুত রস,

ঋষভ বীভৎস, ভয়ানক,

গান্ধার করূণ, শান্ত,

মধ্যম ও পঞ্চম শৃঙ্গার ও হাস্য রস, মধুর রস, এবং

নিষাদ করুণ।"[৭]

সাংগীতিক স্বরগুলির নির্দিষ্ট রসানুবিদ্ধতা সম্পর্কে বিভিন্ন মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি স্বর যে রস ও ভাবের উন্মেষক বা সৃষ্টিকর্তা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সংগীত রত্নাকর সুপ্ত নাদকে অবচেতন মনের গহন থেকে বার করে আনতে উপযুক্ত সংগীত গুরুর যে প্রয়োজন তা প্রকাশ করেছেন। সংগীত শুধুমাত্র কিছু গীত-সংগীত ও তার রীতিনীতিকে বোঝায় না, সংগীতের মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে তাকে জাগরিত করাকেই প্রকৃত মনবৈজ্ঞানিক সংগীত শৈলী বলা হয়ে থাকে। এখানে একটি রাগকে বিভিন্ন শিল্পীর সহায়তায় শোনা যাক। একই রাগ সংগীত বা স্বর সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন রসের বা ভাবের পরিচয় দিয়ে থাকে। উভয় শিল্পী এবং শ্রোতার মনন, চিন্তন কখনই এক হবে না। তাছাড়া পরিবেশের পরিস্থিতি স্বরের পরিণতিকে এক অন্য সোপানে নিয়ে যেতে সাহায্য করে থাকে। যেমন ভূপালী রাগ নবীন এবং প্রবীণের কল্পনায়।

সংগীত সাধনায় রহস্যময় অবচেতন মনের পরিচয়-

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভারতীয় দর্শনলব্ধ আদর্শের সাধক, তিনি প্রতিটি স্বর ও স্বর সমষ্টির মধ্যে এক গুঢ় প্রাণশক্তির ছোঁয়া দেখতে পারতেন। তাই তাঁর রচনায় বর্হিজগৎ অর্ন্তজগতের সম্পূর্ণ প্রতিফলন ছিল বললে ভুল হবে না, সে নিজ সৃষ্টিকে প্রাণশক্তির মাধ্যমে জড়িয়ে রেখেছিলেন এবং তার জন্য সে প্রতিমার মধ্যেও প্রাণস্পন্দন দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'সংগীতচিন্তা' "সংগীত ও ভাব" প্রবন্ধের আলোচনায় বলেছেন "আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলো সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগ রাগিনীর ছাঁচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে, সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।"[৮] আবার সংগীতে মননশীলতা মনোবিজ্ঞানের কার্যকারিতা নিয়ে বলছেন। "আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায়স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি।"[৯] কাজেই মানুষের অবচেতন মনই সৃজন প্রতিভার উৎস এবং এই অবচেতন মন সংগীত শিল্পীর সাধনায় যথার্থ পরিচয় দিয়ে থাকে।

সংগীত শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা -

সংগীত শিক্ষা সম্পূর্ণ দার্শনিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, মনোবিদ্যা, অধিবিদ্যা সমস্ত কিছু দার্শনিক ধারার মধ্যে দিয়ে সংগীত অতিবাহিত করে থাকে। বিশেষ করে শাস্ত্রিয় সংগীতে শুধু আবেগ নয় তার মধ্যে রীতি-নীতি যুক্তির স্থান বিশেষ লক্ষণীয়। শুধুমাত্র সুরকাঠামোকে উপস্থাপিত করলে সে তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না, একটা রাগ পরিবেষণায় লাগে যথোচিত সুর বিন্যাস, সময়বস্থা, বুদ্ধি, চাহিদা, প্রক্ষোভ, প্রকৃতি এবং তাৎক্ষণিক ক্রিয়া। যা মানুষের মনের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ ভাবে দার্শনিক চিন্তাধারার মতে মনের আচরণকেই মনোবিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। যার দ্বারা আমাদের আবেগ তার নির্বাচিত

বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপনা করে থাকে। কাজেই সংগীত যে মনোবিজ্ঞান ব্যতিরেকে গতি করতে পারেনা তা সহজে অনুমেয়। এখানে উত্তরভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে সময় নির্দ্ধারণ উপরে একটি সরল বিচার আলোচনা করা যেতে পারে। মানুষের মনের উপর (Time) সময়ের প্রভাব এবং এই সময়ের পরিবেশ মনের মধ্যে যে একটি বিশেষ স্থান বা ভাব সৃষ্টি করে সেকথা বলাবাহুল্য মাত্র। সংগীতশাস্ত্রীরা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাগের বিকাশকে এবং তার সময় তথা দিন ও রাত্রির নির্দিষ্ট ভাগ গুলি অনুযায়ী যে বিভাগীকরণ করেছেন তা বোঝা যায়, যা একে অপর থেকে কিছুটা পার্থক্য। প্রতিটি বিভাগে রাগগুলিকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। যে রাগ প্রাতঃকালে গেয় এবং যে রাগ মধ্যাহ্নে তাদের মধ্যে স্বরস্বজ্জা গুলি পৃথক পৃথক পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বিশেষভাবে যে রাগ সকলে গাওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে এক গম্ভীর গভীর শান্ত ভাব বিরাজমান করে থাকে যা মনের মধ্যে থেকে উদ্বেলিত হয়ে বর্হিলোকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ভাবে ভাবের মধ্যে প্রকাশ পাওয়ার জন্য মনের যে অবস্থা তার একান্ত পরিচর্যা অত্যাবশ্যক। প্রাচীন কালে সংগীত শিক্ষা যেহেতু প্রকৃতির ক্রোড়ে, গুরুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে পরিচালিত হত, সেহেতু মনের ভাব পরিবেশ থেকে শিষ্যরা পেয়ে যেতো। তাদের অধিক করে মনের আচরণকে পরিবর্তন বা পরিচিত করাতে হত না। যা আধুনিক যুগে দুর্লভ। কারণ বর্তমান পরিবেশে, প্রকৃতি অনেকটা কৃত্রিম ভাবে প্রবহমান বললে অত্যুক্তি হবে না, যার ফলে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব এই সময়ে বিশেষভাবে প্রয়োজন প্রতিটি শিক্ষাবৃত্তিতে। সংগীতে স্বরের পারস্পরিক সংযোগ ও বিকাশ যেমন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমের তেমনি মানুষের মনে রস ও ভাব সৃষ্টিও বিভিন্ন রূপে করে থাকে। দিনের ও রাত্রের পরিবেশ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, রাগ স্বরের একক ও সহ ব্যবহার ও তেমনি বিভিন্ন। এইজন্য উত্তর ভারতীয় রাগসংগীতে স্বর সজ্জা বা রাগ এত মনোজ্ঞ, রসশিক্ত ও ভাবপূর্ণ। মনোবৈজ্ঞানিক রীতিতে আধুনিক যুগে সংগীত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডেজীর সমস্ত রাগগুলিকে পূর্বাঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গ দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। "দিন ১২টা থেকে রাত ১২টা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ এবং রাত্রী ১২টা থেকে দিন ১২টার মধ্যে পূর্বাঙ্গবাদী রাগ গাওয়া হয়ে থাকে।"[১০] "সারিগমপধনি সা" এই স্বরগুলির মধ্যে প্রথম "সা রিগ ম" প্রথম চারটি স্বর যে রাগের বাদী স্বর হয়ে থাকে সেই রাগ গুলিকে পূর্বাঙ্গবাদী রাগ বলা হয়ে থাকে এবং প ধ নি সা যে রাগগুলির বাদী স্বর হয়, সেই রাগগুলিকে উত্তরাঙ্গবাদী বলা হয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উত্তরাঙ্গ এবং পূর্বাঙ্গ বাদীস্বরগুলির ব্যবহারে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। প্রাতঃকাল অর্থাৎ রাত্রির চতুর্থ প্রহর (৪টা থেকে ৭টা) এই স্বল্প সময়ে সাতটি স্বরের বিচিত্র ব্যবহার ও বিকাশ লক্ষ করা যেতে পারে। যা মানুষের সম্পূর্ণ দিনটিকে সুগমভাবে পরিচালিত করতে অনেকটাই সাহায্য করে থাকে। যেমন - ভৈরব, অহির-ভৈরব, বসন্ত মুখারী, রামকেলী, তোড়ী ইত্যাদি। প্রতিটি দিনের মধ্যে একটি করে সম্পূর্ণ জীবনবৃত্ত লুক্কায়িত হয়ে থাকে। প্রাতঃকালে প্রকৃতি তার মধুর স্পর্শে জাগরিত করে প্রতিটি জীবকূলকে আর প্রত্যেকে সেই স্পর্শে পুর্নঃজীবিত হয়ে নূতন উদ্যমে সুরু করে পথ চলা। কারণ গতকাল আগামীকালকে ধরার জন্য বর্তমানকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করে, তার মনের মধ্যে থাকা অসমাপ্ত অভিলাসকে পূর্ণ করার জন্য। সাধারণভাবে সকাল-দুপুর-বিকাল এইভাবে যে বিভক্তিকরণ করা হয়েছে, দিনের সময়কেও ঠিক তেমনি মানুষের মনের ভাবকে নিয়ে বিভাগীকরণ হয়ে থাকে সময়, ও সুরের মাধ্যমে। মন বা মনের গতি সময় বিশেষে পরিবর্তন হয়ে থাকে। স্বরের পারস্পরিক সংযোগ ও বিকাশ যেমন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমের, তেমনি মানুষের মনে রস ও ভাব সৃষ্টিও তারা বিভিন্নরূপে করে। কারণ দিনের ও রাত্রির পরিবেশ যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, রাগের স্বরের একক ও সহ ব্যবহারও তেমনি নানা রকমের হয়ে থাকে। প্রাচীন কাল থেকে রাগের পরিবেষণ সময় নির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারিত। এক স্বর সমষ্টি সেই নির্দিষ্ট সময়ে পরিবেশিত হলে, তার মধ্যে নিবদ্ধ থাকা ভাব ও রস সৌন্দর্যের পরিপ্রকাশ হয়ে থাকে বলে আমাদের মধ্যে এক প্রকার সংস্কার তৈরী হয়ে আছে। তখনকার বিশিষ্ট শিল্পীরা সময়ের পরিবেশ, ভাব অনুসারে রাগে নির্দিষ্ট স্বরের ব্যবহার করে গেছেন যা মানুষের মনে এক বদ্ধমূল ধারণা তৈরী করে দিয়েছে। মনোবিজ্ঞানে স্বরের প্রভাব বা স্বরের প্রয়োগ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে এবং তার সহ সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মতে যেভাবে প্রচলিত সময়ানুক্রমে তার এক সংক্ষিপ্ত উদাহরণ। যেমন-

১. "প্রাতঃকাল (৪টা-৭টা) সাম, মসা, পসা, ধরি/ সাপ, গনি, মসা, ধগ/মসা, পসা, ধরি, ধগ/সাম, মসা মনি, পসা, ধনি/সাম, মনি, পসা, ধগ

২. দিনের প্রথম প্রহর (৭টা-১০টা) মসা, ধরি/ সাম, সাপ, গধ, গনি, মসা, পসা, পরি, ধগ,ধরি/সম, সাপ, গধ, মস, পরি, ধণ।

৩. দিবার দ্বিতীয় প্রহর সাম, রিগ, গণি/ রিপ, মসা, পসা, পরি, দরি, ধগ/ রিপ, (১০টা-১২টা) মসা, পসা, পরি।

৪. মধ্যাহ্ন রি-প স্বর দুটির বহুল ব্যবহার। (১২টা-১টা)

৫. দিবার তৃতীয় প্রহর সাম, সাপ, গণি, মসা (১টা-৪টা)

৬. দিবার চতুর্থ প্রহর রিধ, গণি, পসা (৪টা-৭টা)

৭. সন্ধ্যাকাল সাপ, রিপ, রিধ, সপ, গধ, গণি, মসা, পশ, পরি/ রিপ, গণি, পসা, পরি, সাপ। (৪টা-৭টা)

৮. রাত্রির প্রথম প্রহর সাম, ধগ (৭টা-১০টা)

৯. রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর সাম, সাপ, রিপ, রিধ, গধ, গণি, মসা, পসা/ রিপ, পাসা, (১০টা-১টা) রিধ, রিধ, গধ, গণি, মসা, পসা।

১০. মধ্যরাত্রি সাপ, রিপ, পসা, মসা, সাপ, মসা, পসা, পরি/ সাপ, রিপ, মসা, পসা। (১২টা)

১১. রাত্রি তৃতীয় প্রহর সাপ, মসা, পসা। (১টা-৪টা)

১২. রাত্রি চতুর্থ প্রহর সাম, সাপ, গধ, মসা, ধগ/ পসা, ধগ। (৪টা-৭টা)

এর মধ্যে (সাপ, গণি) প্রায় দিন ও রাত্রির সকল সময়ে ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে সেই সময়কার বাধ্যবাধকতা প্রথাকে মানা হয়না। তবে মোটামোটি ভাবে সময়ানুসারে স্বরগুলির বিকাশ এই ধরনের হয়ে থাকে। এই সময়ের আরো একটি সংক্ষিপ্ত সময়সূচি প্রদত্ত করা হল। এখানে শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বর সহযোগে রাগ পরিবেশনের সময় নির্ধারিত হয়েছে। যেমন-

"সকাল (৪টা-৭টা) রে, গ, ধ, ধ মারত্বা, ভৈরব, পূর্বী ঠাট

সকাল (৭টা-১০-১২টা) রে, গ, ধ বিলাবল, কল্যান, খম্বাজ ঠাট

দিবা (১০.১২টা-৪টা) গ, নি কাফী, আশাবরী, ভৈরবী ঠাট

অপরাহ্ন/বিকাল (৪টা-৭টা) রে, গ, ধ, ধ মারত্বা, পূর্বী, ভৈরব ঠাট

রাত্রি (৭টা-১০.১২টা) গ, নি কাফী, আশাবরী, ভৈরবী ঠাট"[১১]

এই চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে সকল রাগে রে ও ধ স্বরদুটি কোমল এবং 'গ' স্বরটি শুদ্ধ থাকে সেই রাগগুলি পরিবেশনের সময় নির্ধারিত হয়েছে সকাল এবং সন্ধ্যা ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত। এখানে ব্যতিক্রম হিসাবে ধ স্বরটি শুদ্ধ হয়েছে মারোত্বা ঠাটের সন্ধিপ্রকাশ রাগগুলিতে। তবে এই সময়ে 'রে' কোমল এবং গ স্বরটি শুদ্ধ থাকা একান্ত অনিবার্য। এইভাবে উপরোক্ত স্বর সময়ের মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয়ে এক মনোজ্ঞ পরিবেশ। সুরশিল্পী বা সংগীত সাধক যখন যথোচিত স্বরবিন্যাস ও স্বরের রস অনুযায়ী রাগ-রাগিনী পরিবেশন করেন, তখন তাঁর মনে থাকে রাগ রাগিনীর রূপবৈচিত্র, যা সে তাঁর জীবনের অনুভব দিয়ে উপলব্ধি করে থাকে। এখানে সম্পূর্ণ

মনের ইচ্ছা, আবেগ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি ক্রিয়াগুলির প্রয়োজন হয়ে থাকে। কারণ এই সমস্ত ক্রিয়াগুলি শিল্পীর অবচেতন মনে সুপ্ত ভাবে থাকে, যা স্বরের বিস্তার ও আলাপের সংগে সংগে সেই সুপ্ত ধারণা মানসপটে জাগ্রত হয়ে, এক প্রত্যক্ষ আকারে রূপায়িত হয়ে থাকে। সেই সুর ও ভাব অনুসারে গতি বা ছন্দ আসে প্রত্যক্ষে। তবে এখানে একটা কথা খুবই প্রাসঙ্গিকতা রাখে যেমন দরদী শিল্পীর কাছে রস-ভাব-মননশীলতা অনুভাব জিনিসগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে, বিশ্লেষিত হয়ে আসে না যদিও সাধক শিল্পী পরে তাকে বিশ্লেষণ করেন, কেবল তাঁর অনুভবটা ঠিক হয়েছে কিনা মিলিয়ে দেখার জন্য। দরদী শিল্পীর জন্য এই পথটাই ঠিক। সাধারণ শিল্পী বা দরদী অনুভবী শিল্পী যে কেউ হউক না কেন স্বরের ভাব-অনুভাব মনের মধ্যে অন্তলোক থেকে সামূহিক জনসমাজে পরিবেশিত করা সম্পূর্ণ নিজস্ব আচরণের মধ্যে পড়ে। কাজেই প্রথমে স্বর সমষ্টিগুলি ভয়ানক রূপ ধরা দিলেও পরে তাতে করুণ, শান্ত ভাব ফুটে ওঠে। তাই "হনুমন্মতে 'ভৈরব' রাগকে আদি রাগ বলা হয়, কারণ তাতে ভয়ানক ও বীভৎস রসের সংচার থাকলেও শৃঙ্গার অথবা পরবর্তী শান্তরসের প্রাধান্যই দেখা যায়, যার ফলে করুণ ভয়ানক প্রভৃতি রসও নির্বেদ বা বৈরাগ্যের উদ্বোধক ও নিয়ামক, প্রতিরোধক নয়।"[১২] খ্রীস্টীয় ১৩শ ১৪শ থেকে ১৮শ শতকে রাজপুত, মোঘল শিল্পী, ১৮শ শতকে মুর্শিদাবাদের চিত্রকলা, ১৭৫৫ স্ত্রী নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার রাজত্ব সময়ে মনের ভাবকে রাগ রাগিনীর স্বর চিত্রর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, যা আজও অনেককে ভাবায়। যেমন "চিত্র, ধনাশ্রী, বিলাবল, কেদার, ললিত ইত্যাদি।"[১৩] মানব মাত্রই স্বরের এক পরিবেশে বেড়ে ওঠা। তার চারিপাশে যে সমস্ত ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকে যেমন ঝির ঝির, স স হাওয়া, টুপ টুপ বৃষ্টি এক নির্দিষ্ট গতি বা ধারা আছে, যার মাধ্যমে সংগীতের প্রাথমিক পরিচয় হয়ে থাকে। যেমন এক শিশুর মনে প্রশ্ন ওঠা এবং তার সমাধান চিত্রের মাধ্যম দিয়ে করা সহজ, ঠিক তেমনি প্রাথমিক সংগীত শিল্পী রাগ চটা করার সময় স্বর চেনা, তার মধ্যে ভাবকে খুঁজে বার করা, তার পক্ষে খুব একটা সহজ কাজ হয়ে দাঁড়ায় না। সেক্ষেত্রে সে যদি কিছু রাগ রাগিনীর বা কিছু স্বর সমষ্টির চিত্র প্রত্যক্ষ করে তবে তার মধ্যে এক অন্য ভাব সৃষ্টি হওয়ার প্রবণতা জন্ম নেয় এবং সময় ক্রমে সে অনেকটা আগেই স্বরের আবেদনকে নিজস্ব কল্পনার পরিধি মধ্যে বেঁধে রাখতে সক্ষম হতে পারে। এখানে কিছু রাগ রাগিনীর চিত্র সহিত স্বর প্রয়োগ দেখা ও শোনা যেতে পারে, উদাহরণ চিত্র শ্রাবৎ মনের চিত্তবৃত্তি (mood) কোন কিছুকে উপস্থাপিত করবার জন্য মুখ্য স্থান গ্রহণ করে থাকে। প্রত্যকেটি প্রক্ষোভ সৃষ্টি হবার জন্য একটি করে উদ্দীপক সম্পর্কের দরকার। কারণ শরীরের অভ্যন্তরে যান্ত্রিক সংবেদন (organic sensation) পরিবর্তন হলে আমরা আমাদের ভাব প্রকাশ করি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে। ধারণাগত প্রক্রিয়ার ফলে (Due to percept of ideas) আমরা কিছু উপস্থাপনা (Presentation) করে থাকি যা সব সময়ে মনের চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করে থাকে। কারণ প্রতিটি রাগ, বস্তুর বিপরীতে একটি করে মনোবৈজ্ঞানিক ধারা লুকিয়ে থাকে যা এ প্রকৃতি পরিবেশের সকল জিনিসের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যখন এর মধ্যে ভাবের উদ্রেক হয় তখন তাদের মধ্যে একটা বাহ্য এবং অন্তরের সংবেদন সৃষ্টি হয়। সংগীতিক মনোবিজ্ঞানকে বিশেষ করে জড়বাদ বা বস্তুতত্ত্ববাদ এবং ভাববাদ বা আধ্যাত্মবাদ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকে উপনিষদে অন্তঃকরণ বা মনের ভাবের বিকাশের উপর জোর দেওয়া হত যা সমস্তটাই আধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদ সম্বলিত। কারণ কিছু নির্দিষ্ট স্বর সমষ্টিই একটি প্রকৃত স্বভাব ভাবের পরিপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়ে থাকে যাকে মনের সূক্ষরূপেরস্থূলবিকাশ রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সংগীতে রাগরূপ ও তার গঠন সৃষ্টি হয় স্বরের সাহায্যে যা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় যাকে মানস প্রত্যক্ষ বলা হয়ে থাকে। যে কোন স্বর বা স্বর সমষ্টি প্রত্যক্ষ হয় কর্ণরূপি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এখানে ইন্দ্রিয়কে জড়বস্তু বলা হয় যার কোনো অনুভূতি ক্ষমতা নেই। একটি প্রশ্ন আসে তবে রাগ বা স্বরের অনুভব করে কে? অনুভব করে চেতন মানুষ। বিজ্ঞান বলে শব্দবাহী স্নায়ুতন্ত্রী শব্দকে বহন করে নিয়ে যায় মনের স্তরে, সেখানে সৃষ্টি করে আনন্দের তরঙ্গ। আর তার প্রত্যক্ষ বুদ্ধি দিয়ে এক সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরী করে। যার সরাসরি সৌন্দর্য্য/লাবণ্যকে স্পর্শ করে চেতনার স্তর যেখানে শরীরী ভাব ভঙ্গীমার মাধ্যমে সুরময় আনন্দে রঞ্জিত হয় মন এবং মানসিকতা। শিল্পী এক নির্দিষ্ট রূপের আধারে নিয়মিত বিচরণ করে থাকে। যখন সে সুরের আধারে যত্রতত্র সুখ-শান্তির স্পর্শ অনুভব

করতে পারে আর দিতে পারে। তখনই তার রাগ হয় প্রাণময়, চেতনাদীপ্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উক্তি বলে, "আমাদের দেশে রাগরাগিনী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল, কিন্তু ভাব তো মনের বস্তু। সংগীত রাগ-রাগিনীদের বাইরের প্রতিফলন মাত্র। কাজেই মন, বুদ্ধি এবং বোধি (প্রজ্ঞ) এই তিনটি অন্তরের বস্তুই স্বরের পরিচালনা করে থাকে। এই চৈতন্যদীপ্ত স্বপ্রকাশ বস্তুই সংগীতের আধার এর ব্যতিরেকে সংগীত সৃষ্টি সম্ভব নয়। সংগীতের উদ্দেশ্য ছিল জীবনের চির প্রশান্তি লাভ করা। তাই সংগীত সাধনায় যোগরূপ কর্মকৌশল প্রয়োগ ছিল অবধারিত। বর্তমান মনের সংগে সেই বোধি যুক্ত করে যে প্রয়োগকৌশলের অভ্যাসযোগ ছিল তা বেশীর ভাব বিস্তৃত সুতরাং বর্তমান সংগীতে শাশ্বত আনন্দময় সত্তার প্রত্যক্ষ অভাবনীয় ভাবে দৃশ্য হয়।"[১৪] এখানে বুদ্ধিবাদীরা দার্শনিক হউক বা সাঙ্গীতিক মনোবিজ্ঞানী হউক, তাঁরা সকলে ব্যক্তির সহজাত ধারণার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। কারণ প্রতিটি ব্যক্তি চেতনার মধ্যে সাধনার চিন্তাশক্তি ছাড়াও একটা বিশুদ্ধ স্বত্তা বা বৌদ্ধিক সত্তা বা মানস বৃত্তি আছে। যাকে ব্যাখ্যা করা সহজ নয়, সংগীতে মনোবিজ্ঞানের স্থান, প্রয়োজন কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ কেবল জ্ঞান দিয়ে বা অনুভব দিয়ে কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ সম্পন্ন হয় না। তার জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ানুভব মানসিক চেতনা। যখন ভূপালী রাগে প্রথম গীত বন্দিশ ধরা হয় 'লাজ বচাও কৃষ্ণমুরারী... "[১৫] তখন এই তিনটি শব্দ নিছক কিছু শব্দ নয়, কিছু স্বর সমষ্টি নয় আবার ছন্দ পূর্ণ গতির ধারা নয়। এর উপরে একটি সত্য হচ্ছে। এ একটি আনন্দানুভব যা পারিপার্শ্বিক থেকে ব্যক্তিগত সত্তার উর্দ্ধে বিকশিত হয় নিজস্ব মহিমায়। সুতরাং সঙ্গীতে মনোবিজ্ঞানের স্থান একটি পদমর্যাদার দাবি রাখে যা সমগ্র ভাবে প্রতীয়মান।

তথ্যসূচী

১. A text book on educational psychology, soma book agency 2015 p. 41

২. A text book on educational psychology, soma book agency 2015 p. 42

৩. A text book on educational psychology, soma book agency 2015 p. 43

৪. মতঙ্গ – বৃহদ্দেশী

৫. শারঙ্গদেব-'সংগীত রত্নাকর, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রাগ ও রূপ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃ.১১৩

৬. শারঙ্গদেব-'সংগীত রত্নাকর, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-'রাগ ও রূপ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃ.১১৬

৭. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-'রাগ ও রূপ' (দার্শনিক দৃষ্টিতে রাগ ও অবচেতন মন) দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৯৯, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কোলকাতা পৃ. ১১৮

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ- 'সংগীত চিন্তা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৯

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ- 'সংগীত চিন্তা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৃ. ১০

১০. দেবব্রত দত্ত-'সংগীত তত্ত্ব' (প্রথম খণ্ড) ব্রতী প্রকাশনী, কোলকাতা ১৯৯৮, পৃ. ৬৩

১১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-রাগ ও রূপ' (দ্বিতীয় ভাগ), শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কোলকাতা ১৯৯৯, পৃ. ১১৮

১২. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-'রাগ ও রূপ' (দ্বিতীয় ভাগ), শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কোলকাতা ১৯৯৯, পৃ. ৪

১৩. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 'রাগ ও রূপ' (দ্বিতীয় ভাগ), শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কোলকাতা ১৯৯৯, পৃ. ৪

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ-'সংগীত চিন্তা' (সংগীত ও ভাব),বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ১৪২১

১৫. Dr. Mohan Kumar Senapati -'Rag Sangit', (Par 1), (creation printing industry) (odia version) BBSR-1993, p16